SANATANODAYA সনাতনোদয়
ISSN (O) : 3048-9318
Vol. 1, No. 1, Year 2024
Available Online : https://sanatanodaya.com/

শ্রীমদ্ভগবদগীতা: মানুষের পরিপূর্ণ নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনলাভের শ্রেষ্ঠ পথপ্রদর্শক

অতসী মহাপাত্র, সহকারী অধ্যাপিকা,
দর্শন বিভাগ,
শহীদ মাতঙ্গিনী হাজরা গভর্ণমেন্ট জেনারেল ডিগ্রি কলেজ ফর উইমেন,
চকশ্রীকৃষ্ণপুর, কুলবেড়িয়া পূর্ব মেদিনীপুর

Abstract (সারাংশ):

বেদ হিন্দুদের আকর ধর্মগ্রন্থ হলেও সর্বাপেক্ষা প্রচলিত গ্রন্থ হল গীতা। মহাভারতে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে কথিত হয়েছে ভগবদ্গীতা তথা কৃষ্ণ-অর্জুন সংবাদ। হিন্দুদার্শনিকরা এবং ধর্মপ্রচারকরা নিজেদের জীবনদর্শনের সঙ্গে সংযুক্ত করে একে উপলব্ধি করেছেন এবং জনমানসে তা প্রচার করেছেন। এই শাস্ত্রে দুজন মহাপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুন আদর্শজীবন সম্পর্কে উপদেশ প্রদান করেছেন, যেখানে ধর্ম এবং নীতি পরস্পরের সঙ্গে মিলেমিশে গেছে। মানবজীবনে নৈতিক ও আধ্যাত্মিকতার সমস্যাগুলি গীতায় অনেকখানি রূপক অর্থে আলোচিত হয়েছে। গীতার মুখ্য প্রতিপাদ্য বিষয় হল কিভাবে জ্ঞান ও ভক্তিকে যুক্ত করে শাস্ত্রসম্মত উপায়ে কর্তব্যসাধনের মধ্য দিয়ে মানুষ তার পরমপুরুষার্থকে লাভ করতে পারে তা নির্দেশ করা। কর্মই হল মানুষের ধর্ম। কর্ম অতিরিক্তভাবে বা কর্ম ভিন্ন তার আর কোন লক্ষ্য নেই অর্থাৎ কর্মই হল কর্মের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য। মানুষের জীবনে সাত্ত্বিক এবং রাজসিক উভয় প্রকার গুণের অনুশীলন অত্যাবশ্যক। এটি হল গীতার উপদেশ। গীতার আদর্শ হল অনাসক্ত বুদ্ধিতে কর্মসম্পাদন- এই পথে সমগ্র মানবজাতির কল্যাণ সাধন সম্ভব। গীতার আরম্ভ হয়েছে যুদ্ধক্ষেত্রে অর্জুনের বিষাদের মধ্য দিয়ে। ক্ষাত্রধর্মের প্রেরণায় অর্জুন কৌরবদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেছেন। অস্ত্রপ্রয়োগের ফলস্বরূপ স্বজনহত্যার গ্লানি তাঁকে অস্ত্র ব্যবহারে বাধা প্রদান করেছে। এজন্য তিনি অস্ত্রত্যাগ করাকে তিনি তাঁর প্রধান কর্তব্য বলে মনে করছেন। কুরুক্ষেত্র প্রাঙ্গণে মিত্রপক্ষ ও শত্রুপক্ষের মধ্যে যুদ্ধ সম্মুখে দেখে এবং এই যুদ্ধে আসন্ন মৃত্যুর আশঙ্কা এবং পাপের ভয়ে অর্জুন যুদ্ধ পরিত্যাগ করার সংকল্প করেছেন এবং সন্ন্যাস গ্রহণ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। এইভাবে কর্তব্যের দ্বন্দ্ব যখন অর্জুনকে শারীরিক ও মানসিকভাবে অবসন্ন করে তুলেছিল তখন শ্রীকৃষ্ণ ক্ষাত্রধর্ম পালনের জন্য ফলাকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগপূর্বক কর্মসাধন করার তথা ধর্মযুদ্ধ সম্পন্ন করার উপদেশ প্রদান করেন। এই উপদেশের মধ্যে গীতার নীতিদর্শন প্রকাশিত হয়েছে। এইভাবে গীতার আধ্যাত্মিক ও নৈতিক তত্ত্বসমূহ সাধারণভাবে আলোচিত হয়নি, জীবনের বাস্তব সমস্যার সমাধানে ওই তত্ত্বের প্রয়োগ পরিলক্ষিত হয়েছে। আলোচ্য প্রবন্ধে শ্রীমদ্ভগবদগীতা কিভাবে মানুষের নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক জীবনলাভে সাহায্য করে সে সম্পর্কে আলোচনার চেষ্টা করা হয়েছে।

Keywords (মূলশব্দ): কর্মযোগ, শ্রীমদ্ভগবদগীতা, জ্ঞান ও ভক্তি, পরমপুরুষার্থ, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবন

ISSN (O) : 3048-9318
Vol. 1, No. 1, Year 2024
Available Online : https://sanatanodaya.com/

মূল প্রবন্ধ:

শ্রীমদ্ভগবদগীতা হল হিন্দুধর্মের একটি মুখ্যগ্রন্থ। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে যে উপদেশ দিয়েছিলেন, সেই উপদেশাবলির সংকলনই গীতা বা ভগবদগীতা। এটি হল শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক গীত বা কথিত উপনিষদ। উপনিষদের সারকথা গীতায় বলা হয়েছে। তাই একে 'সকল উপনিষদের উপনিষদ' বলা হয়। গীতা মূলত বৈদান্তিক গ্রন্থ। বেদান্ত জ্ঞান সম্বন্ধে যে তিনটি গ্রন্থ প্রামাণ্য বলে পরিচিত তার মধ্যে গীতা হল একটি। তবে গীতার বৈদান্তিক ভাবগুলি সর্বত্রই বিশেষভাবে সাংখ্যযোগের ভাবের দ্বারা রঞ্জিত এবং এই সমন্বয়ই দর্শনশাস্ত্র হিসেবে গীতার বিশেষত্ব। বাস্তবিকপক্ষে গীতায় প্রধানত যোগের ব্যবহারিক প্রণালী শিক্ষা দেওয়া হয় এবং এই ব্যবহারের প্রণালী বোঝানোর নিমিত্তই তত্ত্বজ্ঞানের অবতারণা করা হয়েছে। ভগবতগীতার উদ্দেশ্য হল অজ্ঞানতার অন্ধকারে আচ্ছন্ন এই জড়জগতের বন্ধন থেকে মানুষকে উদ্ধার করা। প্রতিটি মানুষই নানাভাবে দুঃখ-কষ্টের অধীন, যেমনভাবে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময় অর্জুন মহাসমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ গীতার উপদেশ প্রদানের মাধ্যমে অর্জুনকে মোহমুক্ত করেছিলেন। অর্জুনের মতো এই জগতের প্রতিটি জীব সর্বদাই উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার দ্বারা জর্জরিত, মর্মাহত। এই অনিত্য অস্তিত্বের ফলেই মানুষ প্রতিনিয়ত দুঃখ কষ্টভোগ করছে। কিন্তু মোহাচ্ছন্ন অবস্থা কাটিয়ে উঠলে সে নিজ স্বরূপ সম্পর্কে সচেতন হতে পারে এবং নানা প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে পারে।[১] যেমন আমি কে? আমি কোথা থেকে এলাম? আমার কর্তব্যকর্ম কি? আমার কষ্টের কারণ কি? মৃত্যুর পর আমি কোথায় যাব? জীব কি? প্রকৃতি কি ? ভৌতিক জগত কি? জীবের কার্যকলাপ কীভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়? প্রভৃতি। যিনি এইসব তত্ত্বকে আন্তরিকভাবে অনুসন্ধান করেছেন, তিনি শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অকৃত্রিম ভক্তি অর্জন করেছেন। অর্জুন হলেন এমন একজন অনুসন্ধানী শিক্ষার্থী, যিনি তা অর্জন করেছিলেন। মানবজীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্বন্ধে মানুষকে সচেতন করে দেওয়ার জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে শিক্ষার্থী রূপে গ্রহণ করে ভগবদ্গীতার মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষা প্রদান করেছেন। আপাতদৃষ্টিতে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে অর্জুন সাময়িকভাবে মোহাচ্ছন্ন হয়ে পড়লে তাকে সংকটময় অবস্থা থেকে মুক্তিপ্রদানের জন্য শ্রীকৃষ্ণ পথপ্রদর্শকের কাজ করলেও প্রকৃতপক্ষে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে প্রকাশ্যে রেখে তত্ত্বজ্ঞান সমন্বিত ভগবৎগীতা বর্ণনা করেছেন সাধারণ মানুষের উদ্দেশ্যে, যাতে তারা মানবজীবনকে সার্থক করে তোলার জন্য আদর্শ উপায়ে বা ধর্মপথে তাদের জীবনকে অতিবাহিত করতে পারে। তাই Hiriyanna বলেছেন, "We should, however, remember that Srikrishna is really addressing all men through his devotee, Arjuna, and teaching ....is not restricted in its application to the particular situation that gave rise to it. Its appeal is to all men that find themselves placed in a similar dilemma in life."[২]

গীতার আধ্যাত্মিক ও নৈতিক তত্ত্বসমূহ তত্ত্বজ্ঞান এবং জীবনের বাস্তব সমস্যার সমাধান উভয়ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়েছে। মানবজীবনে নৈতিক ও আধ্যাত্মিকতার সমস্যাগুলি গীতায় অনেকখানি রূপক অর্থে আলোচিত হয়েছে। মানবরূপে অবস্থিত ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হলেন গীতার গুরু। তিনি তাঁর উদ্দেশ্য সাধন করার জন্য যে বিরাট কুরুক্ষেত্র প্রাঙ্গণে মহারণাঙ্গন প্রস্তুত করেছিলেন এবং অলক্ষ্যে তা চালনা করেছিলেন এবং সেই কর্মের নায়ক ও সেই যুগের মুখ্য ব্যক্তিত্ব হলেন অর্জুন তিনি গীতার শিষ্য।

ISSN (O) : 3048-9318
Vol. 1, No. 1, Year 2024
Available Online : https://sanatanodaya.com/

যুদ্ধক্ষেত্রে আত্মীয় পরিজনদের হত্যার সম্ভাবনা দেখে অর্জুন যখন মানসিকভাবে অত্যন্ত বিচলিত ও বিপর্যস্ত, ধর্মাধর্ম জ্ঞান সম্বন্ধে যখন তার ধারণা লুপ্তপ্রায়, তখন জগৎ কি? জীব কি? জীবন কি? ঈশ্বর কি? মানবজীবনের স্বরূপ কি? মানবের কর্মের অর্থ কি? কর্মের উদ্দেশ্য কি? জন্মান্তর কি? অমরত্বের অর্থ কি? জন্মমৃত্যু রহস্য কি? এইসব প্রশ্ন যখন মনে উচ্চারিত হয় সেই সন্ধিক্ষণে শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক গীতার শিক্ষা প্রদত্ত হয়েছে। বিশেষ করে গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে জড়দেহ এবং চেতন আত্মার সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনার মাধ্যমে শ্রীকৃষ্ণ দেখিয়েছেন আমাদের স্বরূপ, আমাদের প্রকৃত পরিচয়, পারমার্থিক তত্ত্বের উপলব্ধি এবং কর্মফলে নিরাসক্তি ছাড়া এই অনুভূতি জাগ্রত হয় না। মানবজীবনের কর্তব্যকর্ম সম্বন্ধে আধ্যাত্মিক, সামাজিক, নৈতিক যে সকল আইন বিধিবদ্ধ আছে তাদের সমষ্টিকে ভারতবর্ষে ধর্ম বলা হয়। মানুষের ধর্ম কি বিশেষত উচ্চহৃদয়, আত্মজয়ী, জননায়ক যুদ্ধ বিশারদ ক্ষত্রিয় বীরের ধর্ম কি-এটি ছিল অর্জুনের প্রধান চিন্তা। তাই তিনি জীবনে সেই ধর্মের অনুসরণ করেছেন। ক্ষত্রিয় জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য কি? প্রকৃত সুখ কি? এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ দেখিয়েছেন ক্ষত্রিয় জীবনের প্রধান সুখ হল কোন মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত জীবন দেওয়া অথবা যুদ্ধ করে বীরের মুকুট অর্জন করা এবং বীরোচিত গৌরবের সঙ্গে জীবনযাপন করা। ধর্মযুদ্ধ অপেক্ষা ক্ষত্রিয়ের আর কোন কিছুতে শ্রেয় নাই। এটাই হল ক্ষত্রিয়ের ধর্ম। তাই ধর্ম প্রসঙ্গে শ্রী অরবিন্দ বলেছেন, মানুষের কর্তব্য হল ভগবানকে জানা, নিজেকে জানা, মানুষকে সাহায্য করা, ন্যায়কে ধর্মকে রক্ষা করা, ভয় ও দুর্বলতাকে বর্জন করে অবিচলিতভাবে সংসারে তোমার কার্য সম্পন্ন করা, কেননা তুমি সেই অনন্ত অবিনাশী আত্মা। তোমার আত্মা অমরত্ব লাভ করার পথেই সংসার এসেছে। জীবন মৃত্যু, সুখ দুঃখ, বেদনা যন্ত্রণা কিছু নয় কারণ এই সকল কিছুকে জয় করতে হবে- এগুলোর ঊর্ধ্বে উঠতে হবে। প্রকৃত আত্মা হল অমর, জন্ম-মৃত্যু লাভ-অলাভ, সুখ-দুঃখের ঊর্ধ্বে অবস্থিত।[৩] সেজন্য নিজের মধ্যে স্থিত অহংকারসমূহকে দূর করে পার্থিব ও সমস্ত ফলাফলকে তুচ্ছ করে ঈশ্বরের আদেশ অনুসারে কাজ করতে হবে, তবেই কোন পাপ স্পর্শ করতে পারবে না। এইভাবে অর্জুনের দুঃখের যুক্তি, হত্যা বিমুখতার যুক্তি, তার কর্মের অশুভ ফলের যুক্তি- সব যুক্তির ব্যাখ্যা শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক গীতার মাধ্যমে প্রদত্ত হয়েছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ব্যক্তিগত জীবনের নানান বৈষম্যকে ব্যাখ্যার জন্য ভারতীয় নীতিশাস্ত্রে কর্মবাদ স্বীকার করা হয়েছে। কর্মবাদ হল নৈতিক কার্যকারণবাদ, কেননা তা জীবের কর্মফলের সঙ্গে সুখ-দুঃখ, শুভ-অশুভ, পাপ-পুণ্য, প্রতি নৈতিকতা জড়িয়ে আছে। বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করে বলা যেতে পারে এভাবে: মানুষের দৈনন্দিন জীবনে কেউ সুখী, কেউ দুঃখী, কেউ ধনী, কেউ দরিদ্র, কেউ সুদর্শন, কেউবা কুৎসিত, সুস্বাস্থ্যবান, কেউ রুগ্ন প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির মানুষ দেখতে পাওয়া যায়। এই জীবনে আরও দেখা যায় ধার্মিক ব্যক্তিরা প্রায়শ দুঃখভোগ করে কিন্তু অসৎ ব্যক্তিরা অনেক কুকর্ম সম্পাদন করেও সুখের জীবন যাপন করে। ভারতীয় নীতিশাস্ত্রকার দাবি করেন এইরূপ ব্যক্তিজীবনের নানা প্রকার বৈষম্যের কারণ হল পূর্বজীবনের সম্পাদিত কর্ম। কর্মবাদে আরও দাবি করা হয় কৃতকর্ম সর্বদাই তাৎক্ষণিক ফল প্রদান করে না। অনেক ক্ষেত্রে কৃতকর্ম অদৃষ্ট রূপে সঞ্চিত থাকে এবং পরজীবনে তা প্রকাশ পায়। কিছু কিছু কর্মফল এই জীবনে ভোগ করা হলেও অনেক সময় পূর্বজীবনের কর্মফল মানুষ এই জীবনেও ভোগ করে। কর্মফল ভোগের জন্যই জীব জন্মগ্রহণ করে। একজন্মে সমস্ত ফলভোগ নিঃশেষিত না হওয়ায় জীবকে তার কৃতকর্মের ফলভোগ করতেই হয। এইরূপ কর্মফল কোনভাবে হস্তান্তরযোগ্য নয়; এবং ফলভোগ থেকে

SANATANODAYA सनातनोदय
ISSN (O) : 3048-9318
Vol. 1, No. 1, Year 2024
Available Online : https://sanatanodaya.com/

অব্যাহতি পাওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। কোন কর্মের ফলভোগ যদি এক জীবনে শেষ না হয় তা হলেও সেই কর্মফল বিনষ্ট হয় না, কর্মফলের সংস্কার সঞ্চিত থাকে এবং পরজন্মে তা ভোগ করতে হয়। কর্মবাদ তাই জন্মান্তরবাদের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। সর্বকর্মফল নিঃশেষিত হলে তবেই জীব মুক্তিলাভ করে থাকে।[৪] এইভাবে কর্মবাদ প্রতিষ্ঠার জন্য ভারতীয় নীতিশাস্ত্রকারগণ জন্মান্তরবাদের অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন।

গীতা আবহমান কাল ধরে ভারতবর্ষে সাধারণ মানুষের প্রতি কর্মবাদ ও জন্মান্তরবাদের নৈতিক আদর্শ প্রদান করেছে। নৈতিক সমস্যা সমাধানের পথ অন্যতম প্রদর্শক হল গীতা। এই শাস্ত্রে সকল দুঃখশোকের শান্তি আছে, আত্মিক সুখের সন্ধান আছে, কেমন করে সংসারের সকল জন্ম-মৃত্যু সুখ দুঃখ দ্বন্দ্ব মিলনের মধ্যে ঈশ্বরের শুভ ইচ্ছা দেখে পরমশান্তি লাভ করতে পারা যায় তার সন্ধান আছে। প্রকৃতপক্ষে, গীতার উদ্দেশ্য অর্জুনকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করা। কৃষ্ণ অর্জুনকে বুঝিয়েছিলেন ধর্মযুদ্ধে যোগদান করা তার কর্তব্য।[৫] কর্তব্যচ্যুতি মহাপাপ। কর্তব্যবুদ্ধিতে কাউকে হত্যা করলে পাপ হয় না, কেননা শেষবিচারে আত্মা হল অব্যয়, অজর, অমর, শাশ্বত অপরিবর্তনীয় সত্তা। তিনি কাউকে হনন করেন না আবার তিনি কারও দ্বারা হত হয় না। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য আদর্শজীবন বলতে আন্তরিকভাবে সত্যের সাধনা ও আচরণকে বোঝায়, প্রাণহীন আচার পালন নয়। তাই গীতার শেষ অধ্যায়ে আদর্শ পুরুষের স্বরূপ বর্ণিত হয়েছে। মানসিক শুদ্ধি ও পবিত্রতার দ্বারাই আদর্শ পথে অগ্রসর হওয়া যায়, বাহ্যিক চিহ্ন ধারণ অগ্রগতির মাপকাঠি নয়। অর্থাৎ আত্মশুদ্ধি, তপস্যা কায়-মন বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয় সহযোগে করণীয়। সেজন্য কৃষ্ণ অর্জুনকে সাবধান বাণী করেছেন যে, ব্যক্তি ইন্দ্রিয় সংযম করে কিন্তু মনে মনে ইন্দ্রিয়ের বিষয়কে স্মরণ করে সে বিমূঢ়মতি, মিথ্যাচারী। এইরূপ দৃষ্টিভঙ্গির চরম পরিণতি লক্ষ্য করা যায় গীতার কর্মযোগে। শ্রীকৃষ্ণ বলছেন প্রকৃত সন্ন্যাসী হলেন একমাত্র তিনি যিনি কর্মফল ত্যাগ করে কর্তব্যকর্ম করেন। অর্থাৎ যদি কর্মত্যাগ না করে দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে পরিবর্তন আনা যায়- যদি কর্মফলে আসক্তি, ফলের আকাঙ্ক্ষা কর্তব্যবোধ মমত্ববোধ পরিত্যাগ করা যায় তবে কর্ম করেও কর্ম করা হয় না; অর্থাৎ কৃতকর্ম বন্ধনের সৃষ্টি করে না।[৬] সেজন্য গীতায় মোক্ষ বলতে বিশেষ করে বোঝানো হয়েছে কর্মফলের শৃংখলকে অতিক্রম করা। গীতায় কর্মকে বন্ধনের কারণ বলা হয়েছে। এই বন্ধন থেকে মুক্তি হল মানুষের পরমপুরুষার্থ। যে কর্মের দ্বারা বন্ধন হয় সেই কর্মে নৈতিকতা থাকতে পারে না।

ভারতীয় দর্শনে বিশেষ করে গীতায় পরমপুরুষ ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়েছে। ঈশ্বর হলেন মানুষের সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা এবং সংহারকর্তা। মানুষের সমগ্র সত্তা ঈশ্বরের আশ্রিত। তার সমস্ত কর্ম ইচ্ছা সবকিছুই ঈশ্বরের দ্বারা পরিচালিত। কিন্তু মানুষ নিজেকেই নিজের কর্মের কর্তা ও কর্মফল ভোক্তা বলে মনে করে। এইভাবে আমাদের যাবতীয় কর্মের পেছনে থাকে অহংকারবোধ এবং কর্তৃত্বের মোহ। সেজন্য কর্মের ফলভোগ অনিবার্য। কৃতকর্মের শুভ এবং অশুভ ফল অবশ্যই ভোগ করতে হবে। কর্ম হল তাই যা, মানুষকে জন্ম-জন্মান্তরের সংসারের বন্ধনে আবদ্ধ করে। তবে, কোন মানুষের পক্ষে কর্মত্যাগ করা সম্ভব নয়। মানুষ তার স্বভাববশত কর্মহীন হয়ে থাকতে পারে না। কর্মের দ্বারা বন্ধন হলেও মুক্তির জন্য কর্মত্যাগ করার প্রয়োজন নেই। কেননা কর্ম স্বরূপত বন্ধনের কারণ নয়। বন্ধনের কারণ হল আসক্তি। কামনা বাসনা ফলের আকাঙ্ক্ষা এগুলির জন্য মানুষ সংসারে আবদ্ধ হয়। মানুষের পক্ষে কর্মত্যাগ করা সম্ভব না হলেও কর্মের প্রতি আসক্তি ত্যাগ করা সম্ভব। এর ফলেই কর্মের বন্ধন থেকে মুক্তি লাভ করা

যায়। তাই গীতায় বলা হয়েছে- কর্মফলে আসক্তি থাকলে কর্ম জীবের বন্ধনের কারণ হয়ে থাকে। তাই কর্মফলে আসক্তি ত্যাগ করা কর্তব্যকর্ম। ফলের কথা চিন্তা না করে কর্তব্যবোধে সচেতন হয়ে অনাসক্ত হয়ে নিষ্কামভাবে কর্মসম্পাদনই হল কর্তব্য।[৭] এইভাবে নিষ্কাম কর্ম সম্পাদনের দ্বারা ব্যক্তিজীবনের চরমলক্ষ্য অর্থাৎ মুক্তি বা পূর্ণতার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করবে। এইভাবে নীতিবিদ্যা এমন একটা জগতে উত্তরণ ঘটায় যা নীতিবিদ্যার বহির্ভূত।[৮] কিন্তু মানুষ কিভাবে কর্মফলের প্রতি অনাসক্ত হবে? গীতার আধ্যাত্মিকতার পটভূমিতেই এই প্রশ্নের উত্তর প্রদত্ত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে গীতায় দুই প্রকার কর্মের উল্লেখ করা হয়েছে- সকাম কর্ম ও নিষ্কাম কর্ম। উভয় কর্মের উল্লেখ করে নিষ্কাম কর্ম সম্পাদন করা উপদেশ দেওয়া হয়েছে। যেসব কর্মাদি সুখ-দুঃখ উৎপন্ন করে কিংবা বলা যায় যে কর্ম কামনা-বাসনার সঙ্গে জড়িত তাকে বলা হয় সকাম কর্ম। এই সকাম কর্ম বন্ধনের হেতু। অপরদিকে যে কর্ম বন্ধনের কারণ হয় না, ফলাকাঙ্ক্ষা বর্জিত কর্মকে বলা হয় নিষ্কাম কর্ম। ব্যক্তির অধিকার কেবল কর্মে, কর্মফলে নয়। তাই ফলের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে কর্ম সম্পাদন করা যেমন ব্যক্তির কর্তব্য নয়, তেমনি কর্ম থেকে বিরত থাকাও কর্তব্য নয়।

এককথায় গীতার উপদেশের সারকথা হল কর্ম পরিত্যাগ নয়, কর্মের দাবি বা ফলাফল বর্জন করা প্রয়োজন। কিন্তু কামনা-বাসনা যদি কর্মের প্রবর্তক হয়, ফলাকাঙ্ক্ষা যদি কর্মের কোন প্ররোচক হয় তাহলেই কামনা-বাসনা ফলের আকাঙ্ক্ষা ইত্যাদি পরিহার করলে কিভাবে কর্মসাধন সম্ভব? এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছেন- "যোগস্থঃ কুরু কর্মাণি"।[৯] অর্থাৎ তুমি (ধনঞ্জয়) যোগে অবস্থিত থেকে ফলাসক্তি বর্জন করে এবং সিদ্ধি এবং অসিদ্ধিকে সমজ্ঞান করে কর্ম করো। এই প্রকার সমত্ববুদ্ধিই হল যোগ- বুদ্ধি যোগ। গীতার সারকথা হল নিষ্কাম কর্মযোগে স্থিত হয়ে কর্ম করা অর্থাৎ ফলের আকাঙ্ক্ষা বর্জনপূর্বক সিদ্ধি এবং অসিদ্ধিতে সমত্ব বুদ্ধি হয়ে কর্ম করা। একেই গীতায় কর্মযোগ বলা হয়েছে। গীতায় স্বধর্মের ধারণাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছেন যে, স্বধর্ম অনুসারে তার কর্ম করা অর্থাৎ যুদ্ধ করা তার কর্তব্য। এই ধর্মযুদ্ধে যোগদান না করলে তার পাপ হবে। সেজন্য স্বধর্ম রূপ কর্তব্যকর্ম থেকে বিচ্যুত হওয়া অন্যায়। গীতায় উক্ত নিষ্কাম কর্মের সারকথা হল- সকাম কর্মে জগতের হিতসাধন হয় না। সকাম কর্ম কেবল ব্যক্তিস্বার্থ অথবা গোষ্ঠীস্বার্থ সাধন করে। কিন্তু মানুষের কর্মকে এমন হতে হবে যা সকলের হিতসাধন করতে পারে। সকাম কর্মে যে কামনা করা হয় তা সকলের অভিপ্রেত হতে পারে না। যে ফল একজনের কাছে সুখদায়ক তা অন্যের কাছে দুঃখ প্রদায়ক হতে পারে। তাই সকলের জন্য কর্ম সম্পাদন করতে হলে ফলের আকাঙ্ক্ষাকে বর্জন করতে হবে। কর্মফলের কামনা পরিত্যাগ করে কেবলমাত্র কর্তব্য স্থাপনের নিমিত্ত যে কর্ম তাই হল প্রকৃত সৎকর্ম। সেজন্য গীতায় বলা হয়েছে যিনি ইন্দ্রিয়সমূহকে জয় করতে পেরেছেন অর্থাৎ যিনি জিতেন্দ্রিয় তিনি চঞ্চল প্রকৃতির কামনা-বাসনা দ্বারা বিক্ষুব্ধ না হয়ে আত্মা তথা পুরুষের স্বরূপ উপলব্ধি করে আত্মস্থ হন এবং এবং আত্মানন্দে জগতের হিতায় কর্মসাধন করেন। জ্ঞান ও ভগবৎ ভক্তিকে একত্রিত করে নিষ্কাম কর্ম সম্পাদন করেন। ব্যবহারিক জীবনে জীব বা ব্যক্তি দেহমন যুক্ত নিজেকে আমি বলে মনে করে থাকেন। অহংকারবোধ ও মমত্ববোধবশত দেহকে আমি বা আত্মা বলে মনে করে। গীতায় সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ব্যক্তিদের স্বভাব বৈচিত্র্য পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। সাত্ত্বিক পুরুষ অহং, বুদ্ধিহীন, নিরাসক্ত, উদাসীন। তিনি কর্তব্য বুদ্ধির দ্বারা প্রণোদিত হন; কর্মের প্রতি তিনি নিষ্ঠাবান। রাজসিক ব্যক্তি অহংসর্বস্ব আবেগ তাড়িত, ফলের আশায়

ISSN (O) : 3048-9318
Vol. 1, No. 1, Year 2024
Available Online : https://sanatanodaya.com/

আকুলিত; এবং তিনি কর্মের সিদ্ধি-অসিদ্ধির দ্বারা বিচলিত। তামস ব্যক্তি অজ্ঞ, বিচারবুদ্ধিহীন এবং অলস। এই ব্যবহারিক আমির পশ্চাতে যে নিত্য, অজ, অব্যয় আমি আছেন তাঁকে আত্মস্বরূপ বলে জানলে, আমরা ক্ষুদ্র সীমিত ব্যবহারিক আমির পরিধি অতিক্রম করতে সমর্থ হবো- এটাই হল জীবের জীবনের মূল লক্ষ্য।

আত্মার স্বরূপের ধারণাই হল গীতার নীতিকথার মূলকথা, যা প্রধানত দ্বিতীয় অধ্যায়ে পাওয়া যায়। এই আত্মা বেদান্তের স্বরূপসত্তা। তিনি হলেন সাংখ্যকারদের পুরুষ। ইনি হলেন নিত্য শাশ্বত পুরাণ। আবার এই আত্মা সমস্ত কার্যকারণ সম্পর্কের বহির্ভূত বলে ইনি অপ্রমেয়, অচিন্ত্য, অব্যক্ত, অচ্ছেদ্য এবং অশেষ্য। এই আত্মা আমাদের সকল অনুভূতির মূলে, এবং জীবনের লক্ষ্য হল আত্মার স্বরূপকে জানা। তাই গীতার অনুশাসন সঠিকভাবে বুঝতে গেলে আত্মার স্বরূপ সম্পর্কিত বিষয়টিকে সম্যকভাবে জানা প্রয়োজন। ভারতীয় দর্শনচর্চার পরিপ্রেক্ষিতে একথা বলা যায় যে নীতিশাস্ত্র মাত্রেই পশ্চাতে কোন স্ফূট কিংবা অস্ফূট অধিবিদ্যক সিদ্ধান্ত থাকে। ভগবতগীতায় নৈতিকতার দিক সেই সিদ্ধান্ত সাংখ্য বেদান্ত পটভূমিকায় আলোচিত এবং এর বিভিন্ন স্থানে তা ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। যেমন গীতার ত্রয়োদশ অধ্যায়ে পুরুষ ও প্রকৃতির স্বরূপ থেকে মানুষের বিশ্লেষণ করা হয়েছে এবং পুরুষকে সাক্ষী দ্রষ্টা অনুমন্তা, ভর্তা ভোক্তা ইত্যাদি নানা নামে বর্ণনা করা হয়েছে। আবার কর্তব্যকর্মের প্রশ্নে গীতায় বলা হয়েছে সুখ-দুঃখ, পাপ-পুণ্য, জন্ম-মৃত্যু, ইচ্ছা-অনিচ্ছা, লাভ-অলাভ, সিদ্ধি-অসিদ্ধি, জয়-পরাজয় সবক্ষেত্রেই সমভাবাপন্ন কর্তব্য কর্ম সম্পাদন করতে হবে। এই প্রকার কর্ম সম্পাদিত হবে আসক্তি ত্যাগের দ্বারা। আদর্শ পুরুষের বর্ণনা প্রসঙ্গে অনাসক্তির প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়। আসক্তি সম্পন্ন অবিদ্বান ব্যক্তি যে লোকসংগ্রহের কাজ করে থাকেন অনাসক্ত হয়ে বিদ্বান ব্যক্তি সেই লোকসংগ্রহের কাজ সম্পন্ন করেন। যোগী বা সাধু পুরুষগণ কর্ম করেন কামনা ত্যাগ করে আত্মশুদ্ধির জন্য। আরও বলা হয়েছে কামনা বাসনা ত্যাগ করলে বন্ধন থেকে মুক্তি হয়। এই প্রসঙ্গে গীতায় নিষ্কাম কর্মের ধারণায় একটি মাত্রা পরিলক্ষিত হয় তা হল আত্মা সর্বকর্মের ঊর্ধ্বে। এটি গীতার একটি মৌলিক প্রতিজ্ঞা। কিন্তু দেহ অভিমানী পুরুষ কর্মত্যাগ করতে পারে না। তাই যিনি কর্মফলের বাসনা ত্যাগ করেন, তিনি ত্যাগী রূপে বিবেচিত হয়। গীতায় এরূপ ব্যক্তিকে 'স্থিতধী' বা 'স্থিতপ্রজ্ঞ' বলে অভিহিত করা হয়। কেবলমাত্র পরিবর্তিত দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কর্ম করলে সেই কর্ম বন্ধনের ফলস্বরূপ হয় না। আবার এই প্রকার কর্ম কর্মত্যাগ করা কিংবা অকর্মের থেকে শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ সকল প্রকার কর্মত্যাগ না করে সর্বকর্মফল ত্যাগ করা উচিত কাজ। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ লোকসংগ্রহের উদ্দেশ্যে কর্ম করেন। ত্রিলোকে তাঁর কোন কর্তব্য নাই। তাঁর কোন অপ্রাপ্ত প্রাপ্তব্য নেই, তবু তিনি লোকসংগ্রহের জন্য কর্ম করেন। লোকসংগ্রহ বলতে বোঝায় সকল লোককে অর্থাৎ সাধারণ মানুষকে স্ব স্ব ধর্মে প্রবৃত্ত করা ও উন্মার্গ হতে নিবৃত্ত করা। ভিন্ন ভাষায় বলা যায় শ্রীকৃষ্ণ লোকশিক্ষার জন্য কর্মত্যাগ করেননি, সংসারে শ্রেষ্ঠ লোক যে আচরণ করে সাধারণ লোক তা অনুসরণ করে। এমনকি জনকাদি রাজাগণও কাজের মধ্য দিয়ে পরমপদ লাভ করেছেন। এইভাবে গীতায় কর্মযোগ ভক্তিযোগে পর্যবসিত হয়, যেখানে ভক্ত তার সর্বকর্মফল ঈশ্বরের সমর্পণ করে থাকেন। গীতায় নৈতিক ও আধ্যাত্মিক তত্ত্বসমূহ জীবনের বাস্তব সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়ে থাকে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গীতায় জন্ম, মৃত্যু, অমরতা, পুনর্জন্ম প্রভৃতির ব্যাখ্যা উপনিষদ অনুসারী। ব্যবহারিক জীবনে জন্ম, জরা, ব্যাধি, মৃত্যু এই চতুর্বিধ সমস্যা মনুষ্য-জীবনকে পীড়িত করে চলেছে।

ISSN (O) : 3048-9318
Vol. 1, No. 1, Year 2024
Available Online : https://sanatanodaya.com/

মানবজীবনের স্বরূপ, কর্মের উৎস, মৃত্যু, মৃত্যু পরবর্তী জীবন, দেহান্তরপ্রাপ্তি, জগতের স্বরূপ, ঈশ্বরের সাধনা সবকিছুই রূপকার্থে আলোচিত হয়েছে। মানব রূপে অবতীর্ণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হলেন গীতার পরমগুরু। জগতে যা কিছু অস্তিত্বশীল, সবকিছুই ভগবানের প্রকাশ। তিনিই একমাত্র সৎবস্তু। তদভিন্ন জগতের কোন কিছুর স্বাধীন ও স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই। তিনি নিত্য, শুদ্ধ, পরমব্রহ্ম। তবে সাধারণ জীবের মধ্যে যে ভগবৎ শক্তি প্রকাশিত হয় তা মায়ার দ্বারা আবৃত। তাই সাধারণ জীব নিজের মধ্যে দেবত্বকে উপলব্ধি করতে পারে না। সব মানুষের মধ্যেই ঈশ্বর বাস করেন। তবে তিনি কখনই সাধারণ জীবের মতো মায়ার দ্বারা আবদ্ধ হন না। বরং তিনি মায়াধীশ। এককথায় বলা যায় সমগ্র জীবজগৎ ও জড়জগৎ হল ঈশ্বরের প্রকাশ। গীতায় বলা হয়েছে অন্তর্যামী ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর অবতার রূপ গ্রহণ করে মানবশরীর ধারণ করেন। জন্ম-মৃত্যু সবই তাঁর মায়িক জগতের প্রকাশ। ব্রহ্ম কিংবা জীবাত্মার স্বরূপে জন্ম কিংবা মৃত্যু কোন কিছু হয় না। সাধারণ মানুষ অজ্ঞতার কারণে মৃত্যুতে দুঃখিত বা শোকার্ত হয়। কিন্তু জ্ঞানীব্যক্তিরা তা করেন না। এক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে শাসন করে বলেছেন যে, তিনি প্রাজ্ঞ বা জ্ঞানীব্যক্তিদের মতো কথা বললেও আত্মীয় পরিজনের মৃত্যুর ভয়ঙ্কর পরিণতির কথা চিন্তা করে শোক করেছেন। জড়দেহ জন্মলাভ করে তাই তারও একদিন বিনাশ ঘটবেই। কিন্তু আত্মিক সত্তা অবিনাশী, তাই তার কখনো মৃত্যু বা বিনাশ ঘটে না। জড়দেহ অপেক্ষা আত্মসত্তা, ভগবৎপ্রেম অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ। আত্মিক সত্তাই মানুষের প্রকৃত স্বরূপ। মৃত্যুতে দেহের বিনাশ ঘটবে এমনটা ভেবে শোক করা মূর্খতার পরিচায়ক। যিনি উপরোক্ত বিষয়টি জানেন, তিনিই প্রকৃত জ্ঞানীব্যক্তি। তাঁরা কখনোই জীবিত কিংবা মৃতের জন্য শোক করেন না। তারা জানেন মৃত্যুতে পঞ্চভূতাত্মক দেহের নাশ ঘটে। দেহ উৎপত্তি ও বিনাশশীল। কিন্তু দেহস্থিত আত্মা উৎপত্তি বিনাশ রহিত, অবিনশ্বর। এই কারণে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে উপদেশ প্রদান করতে গিয়ে বলেছেন, এমন কোন সময় ছিল না যখন আমি, তুমি এবং এই সমস্ত রাজারা ছিলেন না।[১০] এবং ভবিষ্যতেও আমাদের অস্তিত্ব বিনষ্ট হবে না। কর্মফল অনুযায়ী জীব তার বিভিন্ন অবস্থাপ্রাপ্ত হলেও সর্ব অবস্থাতেই তা ঈশ্বর কর্তৃক আশ্রিত। পরমাত্মার স্বরূপে জন্ম-মৃত্যু না থাকলেও তিনি অঘটন-ঘটন-পটিয়সী ত্রিগুণাত্মিকা মায়াশক্তিকে আশ্রয় করে দেহীর ন্যায় আবির্ভূত হয়ে থাকেন। এই অনাদি অনন্ত মায়াশক্তি তাঁর উপাধি মাত্র নয়, তা ব্যবহার কালজন্য স্থায়ী হয়ে জগতের কার্য্য সম্পাদন করে থাকে। জাগতিক কার্যাদি সম্পাদন করা সমাপ্ত হলে মায়া ও মায়িক জগৎ তিরোহিত হয়। এই মায়িক জগতের আবির্ভাব ও তিরোভাবের নাম হল জন্ম ও মরণ।[১১] পরমাত্মা সকলের হৃদয়ে বিরাজমান। যিনি পূর্ণতালাভ করেন, তিনিই কেবলমাত্র তা উপলব্ধি করতে পারেন।

এইভাবে গীতার শিক্ষায় বলা হয়েছে আত্মা দেহ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। বিষয়টিকে ব্যাখ্যা যায় এভাবে: জন্মের পর দেহযুক্ত জীবের বিভিন্ন প্রকার দৈহিক পরিবর্তন সাধিত হয় এবং শেষ পর্যন্ত তা মৃত্যুমুখে পতিত হয়ে বিনাশ প্রাপ্ত হয়। কিন্তু আত্মার মধ্যে এমন কোন পরিবর্তন সাধিত হয় না। মৃত্যুতে আত্মার কোন বিনাশ ঘটে না। অর্থাৎ কালের নিয়মে জীবদেহে বাল্য, যৌবন, জরা যেমন উপস্থিত হয়, অর্থাৎ বিভিন্নকালে কৌমার, যৌবন ও জরার মধ্য দিয়ে তার রূপ পরিবর্তিত করে পরিণতির দিকে অগ্রসর হয়, তেমনি মৃত্যুকালে ঐ দেহী বা জীবাত্মা এক দেহ থেকে অন্য দেহে রূপান্তরিত হয়।[১২] তাই সাধারণ মানুষেরা মৃত্যুতে ভীত ও শঙ্কিত হলেও স্থিতপ্রজ্ঞ পণ্ডিতেরা মৃত্যুতে কখনোই মুহ্যমান হন না। গীতায় আরও বলা হয়েছে ইন্দ্রিয়বৃত্তির সঙ্গে বিষয়ের সংযোগের ফলেই শীত, উষ্ণ ইত্যাদি বাহ্যিক অনুভূতি এবং

সুখ দুঃখ মানসিক অনুভূতির উদ্রেক ঘটে। এগুলি উৎপত্তি বিনাশশীল তাই অনিত্য। এই সব ইন্দ্রিয়জাত অনুভূতিগুলি অনিত্য হওয়ায় এগুলির কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই। এগুলি নশ্বর ও বিনাশশীল। তা কোন একটি সময়ে বা দেশে তা কোন না কোন আকারে দৃষ্ট হয়। এটি জন্ম, স্থিতি, বৃদ্ধি, ক্ষয়, পরিণাম এবং বিনাশ এই ছয়টি বিকারযুক্ত, অথচ তা বিদ্যমান রূপে প্রতিভাত হয়। কিন্তু চিন্তা করলে দেখা যায় যা অজ্ঞানময়, মায়িক জগতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, তাই হল অসৎ, ক্ষণিক ও পরিবর্তনশীল। এই সব বিষয়গুলিকে সহ্য করার জন্য গীতায় উপদেশ প্রদান করা হয়েছে। যারা সত্যদ্রষ্টা, তত্ত্বজ্ঞানীব্যক্তি, তাঁরা সুখে দুঃখে সমান জ্ঞান করেন এবং শীত-উষ্ণাদির আদি দ্বন্দ্বে বিচলিত হন না। তিনিই মুক্তিলাভের অধিকারী হয়ে থাকেন; অর্থাৎ তিনি মুক্তিলাভে সমর্থ হন। তাঁরা উপলব্ধি করেন জড়বস্তু বিনাশশীল হলেও নিত্যবস্তু আত্মার কোন বিনাশ হয় না। তাঁরা আরও বলেন স্থূলশরীর নিয়ে চিরকাল বর্তমান থাকা অমৃতত্ব নয়, কারণ স্থূলশরীরের উৎপত্তি বিনাশ রয়েছে, তাই সে অমর হতে পারে না। আবার মৃত্যুর পর স্থূল শরীরের বিনাশ ঘটে। এটি বিনাশের পর সূক্ষ্মদেহে তার অবস্থানকেও অমৃতত্ব বলা যায় না। প্রতিটি জীবই মৃত্যুর পর সূক্ষ্মশরীর প্রাপ্ত হয় এবং পুনরায় তা জন্মগ্রহণ করে। বরং জন্ম-মৃত্যু চক্র থেকে নিষ্কৃতি লাভ বা উৎক্রমণই হল অমৃতত্ব লাভ বা মোক্ষ বা মুক্তি। এক্ষেত্রে ভগবৎগীতায় উপনিষদের মতো আসক্তি বা কামনা বাসনা ত্যাগ করে মৃত্যুকে জয় করে অমৃতত্ব লাভ করার কথা বলা হয়েছে। এক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে মৃত্যুর মহামোহ থেকে মুক্ত করার জন্য আত্মার অমরত্ব সম্পর্কে উপদেশ প্রদান করেছেন।

পরিশেষে বলা যায় গীতার কেন্দ্রে রয়েছে অর্জুনের মোহজনিত সমস্যা, যেখানে প্রত্যেক মানুষের জীবনে স্থিত সমস্যা সমাধানের ও নির্মোহ হবার তাগিদ আছে। অর্জুনের সমস্যাকে সামনে রেখে নৈতিকতার মূলসূত্রগুলি আলোচনা করেছেন শ্রীকৃষ্ণ, যে নীতিবোধের ভূমিকায় আছে এক অধ্যাত্মবাদ যার পরিণতি ঘটে ঈশ্বরবাদে। এই নৈতিক অনুশাসনকে ঈশ্বরের ধারণা আরও সমৃদ্ধ করে তোলে। গীতা শুধুমাত্র নীতিশাস্ত্র নয়, আধ্যাত্মিক জীবনের গ্রন্থও বটে। ঈশ্বর ও ঐশ্বরিক অবস্থা বা আধ্যাত্মিকতা হল গীতার সর্বপ্রধান তত্ত্ব। গীতা আধ্যাত্মিক জীবন লাভ করার উপদেশ প্রদান করে মানুষকে অক্ষর এবং উত্তম পুরুষের মধ্যে বাস করার কথা বলে। আবার এই শাস্ত্রে জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তি এই তিনটি মার্গের সমন্বয় সাধন করে আধ্যাত্মিক সত্যের সংগ্রহ ও আদর্শ নৈতিক জীবনের মধ্যে সামঞ্জস্যবিধান করেছেন, যা পূর্ণজীবন লাভের সহায়ক। এইভাবে গীতার মধ্যে যে সার্বজনীন চিরন্তন সত্য নিহিত রয়েছে, তার সাহায্যে মানুষ পরিপূর্ণ নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনলাভ করতে পারে এবং পূর্ণ দেবত্বের দিকে অগ্রসর হতে পারে।

তথ্যসূত্র:

১) স্বামী প্রভুপাদ, (২০০৪) গীতপোনিষদ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা যথাযথ, (Bhagavad-Gita As it is), ভক্তি বেদান্ত বুক ট্রাস্ট, শ্রীমায়াপুর, নদিয়া, পৃষ্ঠা ০৯-১০

২) Hiriyanna, M, (1993), Outlines of Indian Philosophy, Motilal Banarsidass, 1st edition, Delhi, page 123

৩) রায়, অনিলবরণ (অনুদিত), (১৩৩১), *শ্রী অরবিন্দের গীতা* (Essays on the Gita), প্রকাশক: বিভুতিভূষণ রায়, গুইব, কৈয়ব, পোঃ বর্ধমান, শ্রী সরস্বতী প্রেস, ২৬/১ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা, পৃষ্ঠা ৮৮-৮৯

৪) মন্ডল, প্রদ্যুত কুমার, (১৯৯৯), ভারতীয় দর্শন, প্রগ্রেশিভ পাবলিশার্স, কলকাতা ৭৩, পৃষ্ঠা ২৪

৫) চ্যাটার্জি, অমিতা (সম্পাদনা) (১৯৯৮), ভারতীয় ধর্মনীতি, এলাইড পাবলিশার্স লিমিটেড, কলকাতা ৭২, পৃষ্ঠা ২৮৬

৬) তদেব, পৃষ্ঠা ২৮৭

ISSN (O) : 3048-9318
Vol. 1, No. 1, Year 2024
Available Online : https://sanatanodaya.com/

৭) বসু, গিরিন্দ্রশেখর, (১৩৫৩), *ভগবদ্গীতা,* (শ্লোক ২/৪৭) পার্সিবাগান লেন থেকে গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত, কলকাতা, পৃষ্ঠা ৪৯

৮) Swami Nikhilananda, (1952), Hindu Ethics, The Upanisads, Vol 2, page 33

৯) বসু, গিরিন্দ্রশেখর, (১৩৫৩), *ভগবদ্গীতা,* (শ্লোক ২) পার্সিবাগান লেন থেকে গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত, কলকাতা, পৃষ্ঠা ৫০

১০) তদেব, (শ্লোক ২/১২), পৃষ্ঠা ৩৬

১১) রায়, অনিলবরণ (অনুদিত), (১৩৩১), *শ্রী অরবিন্দের গীতা* (Essays on the Gita), প্রকাশক: বিভুতিভূষণ রায়, গুইব, কৈয়ব, পোঃ বর্ধমান, শ্রী সরস্বতী প্রেস, ২৬/১ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা, পৃষ্ঠা ১৬

১২) বসু, গিরিন্দ্রশেখর, (১৩৫৩), *ভগবদ্গীতা,* (শ্লোক ২/১৩) পার্সিবাগান লেন থেকে গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত, কলকাতা, পৃষ্ঠা ৩৭